

কারিগরি শিক্ষা কীভাবে মূলধারা হবে?

শিক্ষা

মশিউল আলম

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত 'স্কিলস অ্যান্ড ট্রেইনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' নামের এক প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর 'জাতীয় স্কিলস কমপিটিশন'-এর আয়োজন করা হয়। গত তিন বছর এই আয়োজন চলছে। দেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এ বছরের চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করা হয় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার। রাজধানীর আইডিবি মিলনায়তনে ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'দক্ষতাবিহীন সনদভিত্তিক শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার ও জাতির জন্য বোঝা তৈরি করে। তাই কারিগরিই হবে শিক্ষার মূলধারা। এ জন্য সরকার পর্যায়ক্রমে শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেবে।'

ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, সরকার ইতিমধ্যে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির হার দেশের মোট শিক্ষার্থীর ১ থেকে ১৪ শতাংশের ওপরে উন্নীত করেছে। ২০২০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশকে কারিগরি শিক্ষায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই তথ্য খুবই আশাব্যঞ্জক, কারণ কারিগরি শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই তাঁদের মধ্যে বেকারত্বের হার সবচেয়ে কম।

২০১৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার সাড়ে ৭ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে এ হার ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ। কিন্তু স্নাতক ও স্নাতক-পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ। অর্থাৎ যে ব্যক্তির শিক্ষার ডিগ্রি যত বড়, তাঁর বেকার থাকার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, স্নাতকের নিচ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার কয়েক বছর ধরে কমে যাচ্ছে। ২০১৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপেই দেখা গেছে, ২০১০ থেকে ২০১৩—এই তিন বছরে এসএসএসি ও এইচএসসি পাস করা তরুণ-তরুণীদের বেকারত্বের হার কমেছে। কিন্তু একই সময়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার সাড়ে ৬ শতাংশ বেড়েছে। ২০১০ সালে এই হার ছিল ৯ দশমিক ৯ শতাংশ; আর ২০১৩ সালে হয়েছে ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ।

সুতরাং শিক্ষিত যুবসমাজের বেকারত্বের হার কমাতে হলে, কিংবা তা যেন আর বাড়তে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়ে তার নিচের পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষার প্রতি তাঁদের আরও বেশি আকৃষ্ট করতে হবে। সেই দিক থেকে কারিগরি শিক্ষাকে শিক্ষার মূলধারায় পরিণত করার সরকারি পরিকল্পনা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ও বাস্তবসম্মত।

কিন্তু এই পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে যদি শিক্ষাক্ষেত্র ও শ্রমবাজারের সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়া না হয়। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে অপরিণামদর্শিতা ও পরিকল্পনাহীনতা লক্ষ করা যাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে কারিগরি শিক্ষাকে শিক্ষার মূলধারায় পরিণত করা এবং বেকার সমস্যার সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যা চলছে, তা দেখে বাবার উপায় নেই এ বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী। অদূরদর্শিতা এমনকি অপরিণামদর্শিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এ স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যার দিকে তাকানো হয়। দেশে এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৯। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরিচালিত প্রায় ৭০০ সরকারি-বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স খোলা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে প্রায় ১০০ হতে চলেছে। এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স পর্যায়ে প্রায় ১০ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হন। প্রতিবছর এসব উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসেন প্রায় ৭ লাখ। কিন্তু এত বিপুলসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত লোকবলের চাহিদা কি আমাদের শ্রমবাজারে আছে? এর অর্ধেকেরও নেই। তাই তো প্রতিবছর প্রায় ৩ লাখ উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণী বেকারের তালিকায় যুক্ত

হচ্ছেন। এ দেশে এসব উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এভাবে বাড়তে বাড়তে এখন প্রায় ২০ লাখে পৌঁছেছে বলে পপুলেশন কাউন্সিল সূত্রে জানা গেছে।

দেশের শ্রমবাজারের কোন খাতে কতসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত জনবল প্রয়োজন, তা নিরূপণ না করেই শত শত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে এবং আরও খোলা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত না করেই এখনো বছরে বছরে বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়ার পেছনে কী চিন্তা বা পরিকল্পনা কাজ করছে, তা মোটেই বোধগম্য নয়।

সেদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ১০ কোটি ৫৬ লাখ, যা ৬৬ শতাংশ। ২০৩০ সালে এই হার ৭০ শতাংশে উন্নীত হবে। এ এক বিশাল সুযোগ। এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। নতুন প্রজন্মকে আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে হবে। তা না হলে এরাই হয়ে উঠবে দেশের জন্য বড় বোঝা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বাস্তববাদী চিন্তা শুরু হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাকে শিক্ষার মূলধারায় পরিণত করার পরিকল্পনা খুবই বাস্তবসম্মত এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব, সেটাও ভেবে দেখা দরকার। কারণ, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত কলেজগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা অব্যাহত থাকছে। এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে, এমন তো নয়। তাহলে প্রতিবছর যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছেন, তাঁদের নিরস্ত করার উপায় কী? বা নৈতিকভাবে সেটা করার অধিকার কারও আছে কি না? শিক্ষার্থীমাত্রই সামর্থ্য থাকলে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে চান। অভিভাবকেরাও চান তাঁদের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হোক। কিন্তু সেই উচ্চশিক্ষার উপযোগী জীবিকার সংস্থান এই দেশে আছে কি না, সেটা তাঁরা বিবেচনা করেন না। তাঁদের মধ্যে সেই বিবেচনাবোধ জাগানোর উপায় কী?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত কলেজগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স স্তরে আসনসংখ্যা অপরিবর্তিতভাবে বাড়াতে বাড়াতে এখন এক অসম্ভব শিক্ষা-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো বড় সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়েও বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু সেসব কলেজে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নেই, শ্রেণিকক্ষ নেই, শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বলতে যা বোঝায়, তা নেই। এক দিকে এই অবস্থা অব্যাহত থাকবে, অন্য দিকে কারিগরি শিক্ষাকে মূলধারায় পরিণত করা হবে—এমন স্বপ্ন সফল করা কীভাবে সম্ভব?

● মশিউল আলম : লেখক ও সাংবাদিক।
mashiul.alam@gmail.com

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা অব্যাহত থাকছে। এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে, এমন তো নয়। তাহলে প্রতিবছর যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছেন, তাঁদের নিরস্ত করার উপায় কী?